জাতীয় শিশুনীতি

(ডিসেম্বর, ১৯৯৪)

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকাঃ

দেশের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে শিশুদের জন্য সুষ্ঠু কার্যক্রম গ্রহণ অপরিহার্য। প্রত্যেক শিশুকে দেশের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় সকলের অংশগ্রহণ একান্ত বাঞ্ছনীয়। শিশুরাই দেশের ভবিষ্যত্ কর্ণধার । জাতিকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে শিশুদের উন্নয়নের সার্বিক কার্যক্রম অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রহন ও বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

বাংলাদেশর জাতীয় নীতিতে প্রথম থেকেই শিশু উন্নয়নের চিন্তা স্থান পেয়েছে । বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮ (৪) ধারা অনুযায়ী শিশুদের অগ্রগতির জন্য রাষ্ট্র বিশেষ বিধান প্রণয়ন করতে পারে। শিশু উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে শিশু আইন প্রণয়ন ও ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে স্বাক্ষরদানকারী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম দিকে এবং এর বিভিন্ন ধারাসমূহ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে । সংবিধানের মৌলিক নীতিমালার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে এবং জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের উপর ভিত্তি করে শিশুদের নিরাপত্তা, কল্যাণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সরকার জাতীয় শিশুনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিশুর সংজ্ঞা

বাংলাদেশের বিভিন্ন আইনে শিশুর বয়সসীমা ভিন্ন ভিন্নভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে৷ বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে ১৪ বছর পূর্ণ হয়নি এমন ছেলে-মেয়েদের শিশু হিসেবে গণ্য করা হবে৷

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের শিশু পরিস্থিতি

বাংলাদেশে ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ১৮ বছরের কম বয়সের জনসংখ্যা ৫ কোটি ৬৪ লক্ষ ২৯ হাজার ২২৭ জন (মোট জনসংখ্যার ৫০.৬৩%)৷ দেশে সম্পদের স্বল্পতা, অনুন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের অভাবে অনেক শিশু শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং বাসস্থানের মত মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত।

স্বাস্থ্য ও পুষ্টিঃ

২০০০ সালের মধ্যে "সবার জন্য স্বাস্থ্য" নিশ্চিত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। তবে এখনও অনেক শিশু নানা রোগ এবং পুষ্টিহীনতার সম্মুখীন। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে মোট মৃতের প্রায় অর্ধেক ছিল ৫ বছরের কম বয়সী শিশু। প্রতি ১০০০ শিশুর মধ্যে মাত্র ১০০ জনের কম জন্ম নেয়

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রীর হাতে এবং ৩০০ জনের বেশী শিশুর জন্মকালীন ওজন স্বাভাবিক ওজনের চেয়ে কম থাকে। জন্মের কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ১২ জন শিশু মারা যায়। তন্মধ্যে ৮ জন জন্মকালীন আঘাতের কারণে, ৩ জন গর্ভাবস্থায় পূর্ণতা প্রাপ্তি না ঘটার কারণে এবং অপর ১ জন অন্যান্য কারণে মৃত্যুবরণ করে। আরও ২৩ জন শিশু মারা যায় জন্মের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই। এর মধ্যে ১৬ জন মারা যায় পূর্ণতাপ্রাপ্তি না ঘটায় এবং ৫ জন মারা যায় প্রসব পরবর্তী ধনুষ্টংকারে। এক সপ্তাহ বয়স থেকে এক বছর বয়সের মধ্যে আরও ৭৫ জন শিশু মারা যায়। এর মধ্যে ১১ জন ধনুষ্টংকারে, ২৪ জন নিউমোনিয়াসহ জটিল শ্বাসনালী সর্ম্পকিতরোগে এবং ১৩ জন মারা যায় ডায়রিয়ায়। এক থেকে পাঁচ বছর বয়সের মধ্যে আরও ৭৪ জন শিশু মারা যায়। এ হিসেবে প্রতি বছর ৫ বছরের কম বয়সের প্রায় ৮ লক্ষ শিশু নানা প্রতিরোধযোগ্য রোগে মৃত্যুবরণ করে। ইউনিসেফ কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত " The Progress of Nation" ৯৩ -তে ৫ বছরের কম বয়সী শিশুর মৃত্যুর সংখ্যা প্রতি হাজারে ১৩৩ জন উল্লেখ করা হয়েছে।

এদেশে ১২-১৮ মাস বয়সের মধ্যে শতকরা ৯০ জনের বেশী শিশু পুষ্টিহীন হয়ে পড়ে। শুধুমাত্র দারিদ্র এবং খাদ্যের অভাবেই এমন হচ্ছে না বরং ঘন ঘন বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়া এবং পুষ্টি সর্ম্পকে অভিভাবকদের সঠিক জ্ঞান না থাকাও এর অন্যতম কারণ। বাংলাদেশে সবচেয়ে গরীব পরিবারগুলোর শতকরা ১০ ভাগ তাদের মোট পারিবারিক আয়ের শতকরা ৭৫ থেকে ৮০ ভাগ পর্যন্ত খাদ্য বাবদ ব্যয় করে। ভিটামিন 'এ' এর অভাবে প্রতিদিন প্রায় ১০০ টি শিশু অন্ধ হয়ে যায় এবং অর্ধেকের বেশী অন্ধ হওয়ার ১ সপ্তাহের মধ্যে মারা যায়। ৬ থেকে ৭২ মাস বয়সের ১০ লক্ষ শিশু কম বেশী ভিটামিন 'এ' এর অভাবে ভোগে।

বর্তমানে দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩৮ জনই শরীরে আয়োডিন স্বল্পতাজনিত বিভিন্ন রোগের আক্রমনের সম্মুখীন। শতকরা ১০ জনের গলগন্ড রয়েছে এবং ৩ জন অন্যান্য আইডিডি জটিলতায় ভুগছে। উত্তারাঞ্চলের কয়েকটি জেলায় শতকরা ৫০ থেকে ৭০ জন লোক বর্তমানে গলগন্ডের রোগী। বাংলাদেশের ৯৬% লোকের বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও মাত্র ১৬% লোক তাদের সব ধরণের কাজে টিউবওয়েলের বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করে থাকে। পয়ঃ নিষ্কাশনও একটি বড় সমস্যা। গ্রামাঞ্চলে ৩৩% এবং শহরাঞ্চলে ৫৫% পরিবার স্যানিটারি পায়খানা ব্যবহার করে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক জলাবদ্ধ পায়খানার অভাবে জনসাধারণ খোলা জায়গায় মলমূত্র ত্যাগ করে। ফলে রোগ জীবাণু ছড়ানোর আশংকা বাড়ছে এবং এসব কারনে সব চেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পরিবারের অল্প বয়স্ক শিশুরা।

শিক্ষাঃ

সরকার ২০০০ সালের মধ্যে 'সবার জন্য শিক্ষা' কর্মসূচী গ্রহণ করেছে তথাপিও দেশের শিক্ষা অবকাঠামোর অপ্রতুলতা এবং পারিবারিক অস্বচ্ছলতার কারণে অনেক শিশু শিক্ষা লাভ করতে পারে না। যদিও শতকরা ৮৬ ভাগ ছেলে-মেয়ে স্কুলে ভর্তি হয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই প্রায় ৪০% প্রথম দু এক বছরের মধ্যে স্কুল ত্যাগ করে৷ স্কুলে মেয়েদের ভর্তির হার ছেলেদের চেয়ে কম (৫৩% : ৪৭%)। ছেলেদের চেয়ে অধিক হারে মেয়েরা স্কুল ত্যাগ করে। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার আগেই স্কুল ত্যাগ করার প্রবণতা রোধ করা এবং যারা কখনও স্কুলে ভর্তি হয় না এরকম শিশুদের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করাই দেশের শিশু শিক্ষা ব্যবস্থাপনার প্রধান লক্ষ্য৷ এক হিসাবে দেখা যায়, দেশের ৬ থেকে ১০ বছর বয়সের ১ কোটি ৭৫ লক্ষ শিশুর মধ্যে প্রায় ২.৫ লক্ষ (১৪%) প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার আগেই স্কুল ছেড়ে দেয় । প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের জন্য অগ্রাধিকার এর ভিত্তিতে বর্তমান একাধিক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

শিশু শ্রমঃ

অর্থনৈতিক কারণে এবং পারিবারিক প্রয়োজনে বেশ কিছু সংখ্যাক শিশু অতি অল্প বয়সেই নানা ধরণের শ্রমে নিয়োজিত হতে বাধ্য হয়। শহর, গ্রাম উভয় অঞ্চলেই শিশু শ্রমিক নিয়োগ করা হয়। সরকারের পরিসংখ্যান বিভাগের হিসেব মতে দেশের মোট শ্রমিকের ১২% শিশু শ্রমিক; এ হিসেবে কেবল মাত্র নিবন্ধনকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিশু শ্রমিকদের ধরা হয়েছে। অনিবন্ধনকৃত বা ননফরমাল সেক্টরে কর্মরত শিশু শ্রমিকদের হিসেব করলে এ সংখ্যা আরো বাড়বে। শুধু শহরাঞ্চলেই চরম দারিদ্র্য ও বঞ্চনার মাঝে ১৫ বছরের কম বয়সী যে সকল শিশু শ্রমিক হিসেবে কাজ করছে তাদের সংখ্যা ১৯৯০ সালে প্রায় ২৯ লক্ষ বলে এক সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে।

দেশের প্রচলিত আইনে শিল্প কারখানায় শিশু শ্রম নিষিদ্ধ হলেও জীবিকার প্রয়োজনে শৈশব অবস্থায় অনেক শিশুকে নানা ধরনের শ্রমে নিয়োজিত হতে হচ্ছে।

শিশুর আইনগত অধিকারঃ

শিশুদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও তাদের আইনগত অধিকার নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন সময়ে দেশে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এ সমস্ত আইন বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, অভিভাবকত্ব, কর্মসংস্থান, শিশু শ্রম, শিশু পাচার ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিশুদের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার জন্য প্রণীত হয়েছে। এছাড়া ১৯৭৪ সালের বাংলাদেশ শিশু আইনে শিশু সংক্রান্ত অপরাধের জন্য শাস্তি ও শিশু অপরাধীদের সংশোধনের বিষয়াবলী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এ আইনে শিশুদের হেফাজত (Custody), সংরক্ষণ (Protection) ও (Correction) সংশোধনের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সমাজে অসুবিধাগ্রস্ত শিশুঃ

সমাজে অসুবিধাগ্রস্থ শিশুদের মধ্যে এতিম ও দুঃস্থ শিশু, গৃহহীন/পথ-শিশুর সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, নদী ভাঙ্গন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নানাবিধ রোগ, দুর্ঘটনা ও মানবসৃষ্ট সংকটের কারণে বহুলোক জীবিকার অন্বেষণে শহরমুখী হচ্ছে । ফলে শহরাঞ্চলে দুর্দশাগ্রস্ত শিশুর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পারিবারিক ও সামাজিক কারণেও অনেক শিশু দুর্দশায় পতিত হয়।

প্রতিবন্ধী শিশুঃ

দেশে প্রতিবন্ধীর সংখ্যাও অনেক (মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০%) এর মধ্যে প্রায় অর্ধেকই শিশু। প্রতিদিন ভিটামিন 'এ' এর অভাবে ১০০ টি শিশু অন্ধত্ব বরণ করে। জন্মগত কারণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দূর্ঘটনা, অপুষ্টি ও বিভিন্ন ধরনের রোগের কারণে অনেক শিশু প্রতিবন্ধী হয়ে যায়।

মেয়ে শিশুঃ

দেশে ছেলে শিশু ও মেয়ে শিশুর অবস্থা ভিন্নতর। সচেতন ও অসচেতনভাবে ছেলে ও মেয়ে শিশুর মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, নিরাপত্তা সকল ক্ষেত্রে মেয়ে শিশুরা কম সুবিধা ভোগ করে থাকে। ছেলে শিশুর তুলনায় মেয়ে শিশুর মৃত্যুর হার বেশী।

চতুর্থ অধ্যায়

শিশুনীতির লক্ষ্যসমূহ

উপরোক্ত পরিস্থিতির আলোকে শিশুদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার নিশ্চিত করার নিমিত্তে নিম্নলিখিত ৬টি প্রধান লক্ষ্য চিহ্নিত করা হয়েছে :

(ক) জন্ম ও বেঁচে থাকা : জন্মের পর শিশুর বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তার স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং শারীরিক নিরাপত্তা বিধান।

(খ) শিক্ষা ও মানসিক বিকাশঃ শিশুর সার্বিক মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে তার শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং তার নৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশ সাধান।

(গ) পারিবারিক পরিবেশ: পারিবারিক পরিবেশ শিশুর সঠিক উন্নয়নের একটি প্রধান শর্ত বিধায় পারিবারিক পরিবেশের উন্নতি বিধানে পদক্ষেপ গ্রহণ।

(ঘ) বিশেষ অসুবিধাগ্রস্থ শিশুর সাহায্য : বিশেষ অবস্থায় পতিত অসুবিধাগ্রস্ত শিশুদের জন্য বিশেষ সাহায্যের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় সকল সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা এবং সমতা বিধান করা।

(ঙ) শিশুদের সর্বোত্তম স্বার্থ :সকল জাতীয়, সামাজিক বা পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ রক্ষার নীতি অবলম্বন।

(চ) আইনগত অধিকার : জাতীয়, সামাজিক বা পারিবারিক কর্মকাণ্ডে শিশুর আইনগত অধিকার সংরক্ষণ।

পঞ্চম অধ্যায়

বাস্তবায়ন পদক্ষেপসমূহ :

(ক) জন্ম ও বেঁচে থাকা :

(১) সকল শিশুর নিরাপদ জন্মগ্রহণ ও বাঁচার অধিকার নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যে গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের স্বাস্থ্য, পরিচর্যা এবং পরিবার পরিকল্পনা সেবার মাধ্যমে শিশুর নিরাপদ জন্ম এবং বেড়ে উঠার ব্যবস্থা নেয়া এবং প্রসূতি পূর্ব ও প্রসূতি পরবর্তী প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। কর্মজীবী মহিলাদের প্রসূতিকালীন ছুটির মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া।

(২) শিশুদের বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্য মায়েদেরকে উদ্বুদ্ধ করা। কর্মজীবী মহিলারা যাতে তাদের কর্মস্থলে বাচ্চাদের বুকের দুধ খাওয়াতে পারে সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

(৩) শিশুর খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করা। সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে মায়েদের এবং শিশু লালন-পালনকারীদের শিশু পুষ্টি সর্ম্পকে জ্ঞান দান করা। ভালো ও পুষ্টিকর খাবার গ্রহণের অভ্যাস গড়ে তোলা। বিশেষ করে অন্ধত্ব নিবারণে শিশুদের ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণে উদ্বৃদ্ধ করা।

(৪) শিশুদেরকে ইপিআই টিকাদান কর্মসূচীর আওতায় জীবননাশকারী ৬টি মারাত্মক রোগ থেকে রক্ষা করা। পাশাপাশি প্রাথমিক স্বাস্থ্য শিক্ষার মাধ্যমে ডায়রিয়া, শ্বাসনালী সংক্রান্ত রোগ প্রতিরোধের এবং স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে বসবাসের অভ্যাস করা।

(৫) সকল শিশুকে সমন্বিত স্বাস্থ্য পরিচর্যার আওতায় আনা এবং ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রাথমিক ও স্বাস্থ্য পরিচর্যার উপর জোর দেয়া। সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মায়েদেরকে শিশু বিকাশ, শিশু পুষ্টি বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান দান করা এবং মায়েদের শিশু সংক্রান্ত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচীতে সম্পৃক্ত করা যাতে পরিবারের সকল সদস্য শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা সর্ম্পকে অবহিত হতে পারে।

(খ) **শিক্ষা:**

(১) সকল শিশুর জন্য অবৈতনিক সার্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা।

(২) মেয়ে শিশুর শিক্ষার জন্য ৮ ম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

(৩) প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ হতে বঞ্চিত শিশুদের জন্য উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

(৪) স্কুল ত্যাগী শিশুদের বিশেষতঃ ভর্তি না হতে পারা মেয়ে শিশুদের শিক্ষা লাভের সুযোগ দেয়ার জন্য অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানসমূহের (মাদ্রাসা) উপযুক্ত ব্যবহারের নিশ্চয়তা প্রদান করা।

(৫) শৈশবের শুরুতেই শিশুদের সার্বিক উন্নয়ন/ শিক্ষাদান এবং অন্যান্য প্রস্তুতিমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়নের পক্ষে সমর্থন ও জোরালো প্রচারনা চালানো।

(৬) শ্রমের মর্যাদা সর্ম্পকে উপলব্ধি ও কঠোর পরিশ্রমের প্রতি শিশুদের উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে তাদের জন্য প্রণীত সিলেবাসে এসব বিষয়ে আলোকপাত করা।

(৭) সাধারণ শিক্ষার সাথে সাথে শিশুদের জন্য তাদের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী ও মানসিক প্রবণতা অনুযায়ী উপযুক্ত বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষানবীশ ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বিভিন্ন বৃত্তিমুলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করতে উদ্বুদ্ধ করা।

(৮) শিশুদের জন্য শিক্ষামূলক শিশুসাহিত্য, ছড়া, কবিতা ও গল্পের বই বিনা মূল্যে/ হ্রাসকৃত মূল্যে সরবরাহ নিশ্চিত করা। বিশেষ অসুবিধাগ্রস্ত শিশুদের জন্য উপযোগী বই, পুস্তক প্রকাশনা এবং বিতরণের ব্যবস্থা নেয়া।

(৯) সরকারী/আধা সরকারী সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত শিশুতোষ গ্রন্থ শিশুদের জন্য সহজলভ্য করা।

(গ) **মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ:**

(১) সকল শিশুর সুস্থ মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের লক্ষ্যে নিয়মিত কার্যক্রম গ্রহণ করা।

(২) সকল শিশুকে তার স্বকীয়তা ও যোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষিত করা। তাকে আত্মনির্ভরশীল হয়ে দেশের উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে দায়িত্ব পালনে যোগ্য করে তোলা।

(৩) শিশুর সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা প্রদান করা।

(৪) শিশুকে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ ও ধর্মীয় চেতনার আলোকে চারিত্রিক ও নৈতিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(৫) সকল শিশুকে এমনভাবে গড়ে তোলা যেন তারা দেশ ও বিশ্বকে জানে, প্রকৃতিকে ভালোবাসতে শিখে এবং পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে মৌলিক জ্ঞান লাভ করে।

(৬) শিশুদের সৃজনশীলতা বিকাশের লক্ষ্যে তাদের উপযোগী পূর্ণ ও স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ, চিত্রশালা, যাদুঘর, নৃত্য ও সংগীত বিদ্যালয়, চিত্রাংকন বিদ্যালয় এবং শরীরচর্চা কেন্দ্র গড়ে তোলা।

(৭) শিশুকে তার শৈশবে সকল প্রকার খেলাধুলা, শরীর চর্চা, সংগীত, অভিনয়, আবৃত্তি, নৃত্য এসব বিষয়ে উত্সাহিত করা যেন সে নিজের ভিতরের প্রতিশ্রুতিকে বিকশিত করে দেশের সাংস্কৃতিক মানকে উঁচু করতে সক্ষম হয়।

(ঘ) পারিবারিক পরিবেশ:

(১) শিশুর নিরাপত্তা, শিক্ষা ও উন্নয়নে পিতা-মাতা, অভিভাবক, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রাথমিক দায়িত্ব নিশ্চিত করা।

(২) সকল শিশুকে এমনভাবে গড়ে তোলা যেন তারা পারস্পরিক ভালোবাসা ও শ্রদ্ধায় মানব জাতির পক্ষে বিশ্ব শান্তি, বিশ্ব সংস্কৃতি, সংহতি ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের মহান আদর্শে অনুপাণিত হয়।

(৩) কর্মজীবী মহিলাদের সন্তানদের জন্য " দিবাকালীন শিশু যত্ন কেন্দ্র" স্থাপন করা।

(ঙ) আইনগত অধিকার :

(১) প্রচলিত আইনগুলোর প্রয়োগ/সংশোধন করার সময়ে শিশু স্বার্থ রক্ষার বিষয়টিকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেয়া।

(২) যে কোন অপরাধের জন্য শিশুর উপর দৈহিক বা মানসিক পীড়ন পরিহার নিশ্চিত করা।

(৩) অভিযুক্ত শিশুর প্রতি মানবিক আচরণ প্রদর্শন ও তার মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।

(৪) বিপথগামী শিশুকে সংশোধন করাই হবে প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য।

(চ) বিশেষ অসুবিধাগ্রস্ত শিশু:

(১) পরিত্যক্ত, অবহেলিত, অনাথ, দুঃস্থ ও আশ্রয়হীন শিশুদের উপযুক্ত পরিবেশে আশ্রয়, ভরণ-পোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা।

(২) প্রাকৃতিক দূর্যোগসহ সকল প্রতিকূল অবস্থায় শিশুদের ত্রাণ সামগ্রী বণ্টনের ক্ষেত্রে বিশেষ অসুবিধাগ্রস্ত শিশুদের অগ্রাধিকার প্রদান করা।

(৩) দুর্যোগে সকল শিশুকে রক্ষার জন্য বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা।

(৪) সমস্ত শিশুকে মানব সৃষ্ট সংকট, ঝুঁকিপূর্ণ কায়িকশ্রম, শোষণ এবং দূষিত পরিবেশের ভয়াবহতা হতে রক্ষা করা।

(৫) শিশু শ্রম, শিশু অপব্যবহার, শিশু নির্যাতন ও শিশু পাচার কার্যকরভাবে বন্ধ করা এং অপরাধী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা।

(ছ) প্রতিবন্ধী শিশু :

(১) যে সকল শিশু শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী তাদের জন্য বিশেষ শিক্ষা, চিকিত্সা, আশ্রয়, যত্ন , প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

(২) শৈশবকালীন প্রতিবন্ধীত্ব প্রতিরোধকল্পে বিভিন্ন কর্মসূচী বিশেষ করে টিকাদানের মাধ্যমে পোলিও, মাইলাটিস, আয়োডিন বা ভিটামিন 'এ' এর অভাবজনিত পংগুত্ব নির্মুলকল্পে কর্মসূচীর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(জ) মেয়ে শিশু :

(১) মেয়ে শিশু ও ছেলে শিশুর মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।

(ঝ) সবার আগে শিশু :

(১) সর্বাবস্থায় শিশুর প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার প্রদান।

(২) শিশুদের সর্ম্পকে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা অব্যাহত রাখা।

(৩) প্রতি বছর শিশুদের অবস্থার উন্নয়ন সর্ম্পকে সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করা এবং বহুল প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া।

(৪) নির্ধারিত দিনে "জাতীয় শিশু দিবস"/ "বিশ্ব শিশু দিবস" পালন করা।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কর্মকৌশল:

১। ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত ব্যবস্থাপনা:

শিশুরা যে পরিবেশে জন্মলাভ করে সে পরিবেশকে উন্নত, সুন্দর ও প্রগতিশীল করে গড়ে তুলে শিশুদের সার্বিক কল্যাণের জন্য পরিবার, গোষ্ঠী তথা সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হবে।

২। সরকারী ব্যবস্থাপনা:

শিশুদের মৌলিক চাহিদা পূরণে সরকারী সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানসহ গ্রাম পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা হবে। বিশেষতঃ আশ্রয়হীন, অসহায়, অবহেলিত, পরিত্যক্ত, অসুবিধাগ্রস্ত ও প্রতিবন্ধী শিশুদের ভরণ-পোষণ, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে তাদেরকে সরকার কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহে লালন-পালনের ব্যবস্থা জোরদার করা হবে। এ উদ্দেশ্যে প্রয়োজনে নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে।

৩। বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান:

সরকারী ব্যবস্থাপনার সম্পূরক হিসেবে শিশুদের সার্বিক কল্যাণে বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের সহায়তা নেয়া হবে এবং স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে এরূপ কর্মকাণ্ড পরিচালনায় উত্সাহিত করা হবে।

সপ্তম অধ্যায়

জাতীয় শিশু পরিষদ:

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রীকে সভাপতি করে 'জাতীয় শিশু পরিষদ' গঠন করা হবে। শিশু কল্যাণ সম্পৃক্ত মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীবর্গ, সচিবগণ এবং শিশুর সাথে জড়িত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ এ পরিষদের সদস্য হবেন।

পরিষদের কার্য পরিধি:

(১) "জাতীয় শিশু পরিষদ" শিশু কল্যাণ সর্ম্পকিত সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী পরিষদ হিসাবে দায়িত্ব পালন করা।

(২) দেশের সকল শিশুর স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(৩) শিশুর স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষণে প্রচলিত আইনসমূহের সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করা।

(৪) প্রয়োজনে নতুন আইন ও বিধিমালা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত প্রদান।

(৫) শিশু অধিকারসমূহের পূর্ণ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনে বিদ্যমান আইনসমূহের সময়োপযোগী সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

(৬) "শিশুর অধিকার সনদ" এর সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

অষ্টম অধ্যায়

উপসংহার:

দেশের শিশুদের প্রতি অঙ্গীকারস্বরূপ এ "জাতীয় শিশুনীতি" গ্রহণ করা হলো। শিশুদের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে এবং তাদের যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ "শিশুনীতি" কার্যকরী ভূমিকা রাখবে। এ জাতীয় শিশুনীতির আওতায় বাংলাদেশের সকল শিশু গোত্র, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম বা অন্য কোন মতাদর্শ, সামাজিক প্রতিপত্তি, সম্পদ, জন্ম বা অন্য কোন মর্যাদা নির্বিশেষে সকল অধিকার ও সুবিধাসমূহ সমানভাগে ভোগ করবে।

তথ্যসূত্র : মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়,গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,ঢাকা।